মহাজাগতিক ঠিকানার খোঁজে

(প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে –শেষ পর্ব)

ফরিদ আহমেদ

পূর্ববর্তী পর্বের পর...

If atom stocks are inexhaustible,
Greater than power of living things to count,
If Nature's same creative power were present too
To throw the atoms into unions-exactly as united now,
Why then confess you must
That other world exists in other regions of the sky,
And different tribes of men, kinds of wild beasts.

– *Lucretius*

সেটি (SETI): মহাজাগতিক বুদ্ধিমত্তার সন্ধানে

বহির্বিশ্বে মহাজাগতিক সভ্যতা আছে কিনা তা যাচাই করার সহজ পন্থা হিসাবে প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে বিজ্ঞানীরা বেতার সঙ্কেতকে বেছে নেন। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী গুইসেপ ককোনি (Giuseppe Cocconi) এবং ফিলিপ মরিসন (Philip Morrison) ১৯৫৯ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞান সাময়িকী 'Nature'-এ 'Searching for Intersteller Communications' নামে একটি গবেষণাপত্রে মত প্রকাশ করেন যে, বেতার তরঙ্গ হতে পারে মহাবিশ্বে বিভিন্ন সভ্যতার যোগাযোগের সবচেয়ে কার্যকর পন্থা এবং ফলশ্রুতিতে মহাজাগতিক সভ্যতা চিহ্নিত করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। বিজ্ঞানীদ্বয় এর জন্য ১ থেকে ১০ গিগাহার্জ বেতার তরঙ্গ, বিশেষ করে ১.৪২ গিগাহার্জের বেতার তরঙ্গের কথা উল্লেখ করেন। কারণ নিরপেক্ষ হাইড্রোজেন থেকে এই ফ্রিকোয়েন্সী নির্গত হয় এবং এই ফ্রিকোয়েন্সীরই ক্ষমতা আছে মিল্কিওয়ে ছায়াপথের ঘন মেঘের আস্তরণ ভেদ করে যাওয়ার। আমাদের মতো ভিন গ্রহের সভ্যতারাও বেতার তরঙ্গ সম্প্রচার করতে পারে। কাজেই তারা যুক্তি দেন যে আমাদের বেতার দূরবীক্ষণগুলোরও উচিত ওই সমস্ত সঙ্কেতগুলো খুঁজে দেখা । যদিও তারা এ বিষয়ে সাফল্যের নিশ্চয়তা দিতে পারেননি, কিন্তু তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে যদি আমরা কখনোই অনুসন্ধান না চালাই তবে সেক্ষেত্রে আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনা একেবারে শূন্যই থেকে যাবে।

ককোনি এবং মরিসনের প্রবন্ধই মুলতঃ *সেটি*র সুত্রপাতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। ফলে অতি শীঘ্রই বৈজ্ঞানিক মহল পৃথিবীর বাইরে বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব খোঁজার সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হিসাবে গ্রহণ করে নেন।

তবে এ ধরণের গবেষণার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, কোন ফ্রিকোয়েন্সীতে বেতার তরঙ্গ পাঠাতে হবে তা খুঁজে বের করা। যেহেতু, মহাজাগতিক বুদ্ধিমান প্রাণী কোন ফ্রিকোয়েন্সী গ্রহণ করতে পারবে তা জানা নেই সেই হেতু মহাকাশের নির্দিষ্ট স্থানে বিভিন্ন মাত্রার ফ্রিকোয়েন্সী ব্যবহার করতে হয়।

বেতার সঙ্কেত গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও একই সমস্যা বিদ্যমান। আমরা আদৌই জানি না কি গ্রহণ করতে হবে, কেননা মহাজাগতিক প্রাণীরা কিভাবে সঙ্কেত প্রেরণ করবে বা তাদের প্রেরিত তথ্য কিভাবে পুনরুদ্ধার করতে হবে সে সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই নেই।

তিরিশের দশকের শেষের দিকে ইলিনয়ের হুইটন শহরে বেতার ইঞ্জিনিয়ার গ্রোট রবার্ট (Grote Robert) তার বাড়ির পিছনের আঙ্গিনায় ডিশ আকৃতির একটি বেতার এন্টেনা তৈরি করেন। রবার্ট তার একত্রিশ ফুট ব্যাসের বেতার এন্টেনা মিল্কিওয়ে ছায়াপথের দিকে তাক করে অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন যে মহাবিশ্বের বিভিন্ন বস্তু থেকে বেতার সঙ্কেত ভেসে আসছে। রবার্টের এই এন্টেনাই ছিল বিশ্বের প্রথম বেতার দূরবীক্ষণ।

বেতার দূরবীক্ষণকে বলা হয় ‘জোতির্বিদদের কান’, যদিও ঠিক প্রচলিতভাবে আমরা যেভাবে বেতার শুনি জোতির্বিদরা ঠিক সেভাবে বেতার সঙ্কেত শোনেন না। একটি বেতার দূরবীক্ষণের কমপক্ষে একটি ডিশ আকৃতির এন্টেনা আছে যা মহাশূন্য থেকে প্রাপ্ত বেতার তরঙ্গ সংগ্রহ করে। এই সঙ্কেতগুলোকে পাঠানো হয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে, সেখানে কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে বেতার তরঙ্গগুলোকে বিশ্লেষণ করা হয় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে বস্তু থেকে বেতার সঙ্কেত এসেছে তার চিত্রও তৈরি করা হয়।

অপটিক্যাল দূরবীক্ষণের তুলনায় বেতার দূরবীক্ষণে বেশ কিছু বাড়তি সুবিধা আছে। বেতার তরঙ্গ অপটিক্যাল তরঙ্গের তুলনায় মহাশূন্যের অনেক গভীরে যেতে পারে এবং কি রোদ কি বৃষ্টি দিন রাত চব্বিশ ব্যবহার করা যেতে পারে। কেননা এগুলো মেঘ ভেদ করে যেতে পারে। মহাকাশের বস্তুসমূহ দিনের বেলাতেও বেতার তরঙ্গ বিকিরণ করে থাকে। বেতার তরঙ্গের মাধ্যমেই আবিষ্কার করা হয়েছে মহাকাশের অনেক কোয়াসার এবং পালসার।

তবে মহাকাশের বস্তুসমূহই একমাত্র বেতার তরঙ্গের উৎস নয়। ১৮৯৫ সালে মার্কনী বেতার আবিষ্কার করার পর থেকে এই পৃথিবীর মানুষেরাও বেতার তরঙ্গ ট্রানসমিট করে চলেছে।

১৯২৯ সাল থেকে আমরা টেলিভিশন সম্প্রচার করা শুরু করেছি যাও একধরনের বেতার তরঙ্গ। AM বেতার তরঙ্গ আমাদের বায়ুমন্ডলে ধাক্কা লেগে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে, কিন্তু *এফএম* বেতার তরঙ্গ আলোর গতিতে চিরকালের জন্য মহাশূন্যে ধাবিত হয়। পৃথিবীর টেলিভিশন সম্প্রচারে *এফএম* বেতার তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়।

দূরবর্তী কোন নক্ষত্রের কোন গ্রহ থেকে কেউ বেতার দূরবীক্ষণ নিয়ে বসে থাকলে তারপক্ষে আমাদের পৃথিবী থেকে আগত বেতার সঙ্কেত চিহ্নিত করা সম্ভব। তবে সেটা কয়েকটা ফ্যাক্টরের উপর নির্ভরশীল। যেহেতু আমরা এফ এম বেতার এবং টিভি সঙ্কেত গত ৭৫ বছর ধরে ব্যবহার করছি, কাজেই সেই গ্রহকে হতে হবে পৃথিবী থেকে ৭৫ আলোকবর্ষের ভিতরে। এছাড়া সঙ্কেত যেহেতু কয়েক বিলিয়ন ফ্রিকোয়েন্সিতে পাঠানো সম্ভব, কাজেই শ্রোতাদেরকেও সঠিক চ্যানেল বা স্টেশনে টিউন করতে হবে। যদি এই মুহূর্তে চল্লিশ আলোকবর্ষ দূরের কোন গ্রহ থেকে কেউ তাদের দূরবীক্ষণ পৃথিবীর দিকে সঠিক ফ্রিকোয়েন্সীতে তাক করে রাখে তাহলে তারা আমাদের ১৯৬৬ সালের বেতার এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠান শুনতে বা দেখতে পারবে।

ফ্রাঙ্ক ড্রেক সর্বপ্রথম *সেটি প্রকল্প* চালু করেন ১৯৬০ সালে, যার নাম ছিল 'প্রজেক্ট ওজমা' (Project Ozma)। ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়ার গ্রীন ব্যাংকের ন্যাশনাল বেতার এস্ট্রোনমী অবজার্ভেটরী থেকে প্রজেক্ট ওজমা ২৮ মিটার বেতার দূরবীক্ষণের সাহায্যে ১৫০ ঘন্টা ধরে ১৪২০ মেগা ফ্রিকোয়েন্সি বিশিষ্ট সঙ্কেত শোনার চেষ্টা করে। সুর্যের অনুরূপ মাত্র দু'টো নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করা হয়, টাউ সেটি (Tau Ceti) এবং এপসিলন এরিডানি (Epsilon Eridani)। কিন্তু ড্রেক কোন মহাজাগতিক সভ্যতার সঙ্কেতের হদিস দিতে সমর্থ হননি। ১৯৭০-৭২ সালের মধ্যে পালমার ও জুকারম্যান 'প্রোজেক্ট ওজমা'-এর মাধ্যমে ৬৭৪টি নক্ষত্রকে অনুসন্ধান করেন। ১৯৭১ সালের এক গ্রীষ্মে দূরবর্তী নক্ষত্রমন্ডল গুলোতে বুদ্ধিমান সভ্যতা থাকার সম্ভাব্যতা যাচাই-এর জন্য নাসা এবং আমেরিকান সোসাইটি ফর ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেশন, চব্বিশজন বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীর সমাবেশ ঘটায়। 'প্রোজেক্ট সাইক্লোপস' নামে অভিহিত আলোচনাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, বহির্জাগতিক বুদ্ধিমত্তা অনুসন্ধানের প্রযুক্তি আমাদের আয়ত্বের মধ্যেই। কিন্তু অনুসন্ধানের জন্য কয়েকশ ডলার খরচ হবে। সাফল্য হয়ত কয়েক দশকের মধ্যে আসতে পারে। সাইক্লোপস প্রকল্পে প্রস্তাব করা হয়েছিল ১৯৭১ সালে ১০০ মিটার ব্যাস বিশিষ্ট ১৫'শ বেতার দূরবীক্ষণ বসানোর। কিন্তু অর্থায়নের অভাবে এটি শেষ পর্যন্ত সাফল্যের মুখ দেখেনি।

ওজমা এবং প্রাথমিক পর্যায়ের সেটি প্রজেক্টের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল যে এগুলো একবারে মাত্র একটি করে চ্যানেল পর্যবেক্ষণ করতে পারতো। আশির দশকের প্রথম দিকে হার্ভাডের পদার্থিবিজ্ঞানের প্রফেসর পল হরোউইজ (Paul Horowitz) 'সুটকেস সেটি' আবিষ্কার করেন

যা একসাথে ১২৮,০০০ চ্যানেল স্ক্যান করতে সক্ষম এবং যা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অনায়াসে সরিয়ে নিয়ে জুড়ে দেওয়া যেতে পারতো যে কোন বেতার দূরবীক্ষণের সাথে।

১৯৭৩ সালে সর্বপ্রথম পুয়ের্টোরিকোর আরেসিবোতে (Arecibo) অবস্থিত বিশালাকৃতির ট্রান্সমিটার থেকে পরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিমান প্রাণীদের উদ্দেশ্যে গভীর মহাশূন্যে বেতার বার্তা পাঠানো হয়। ০ এবং ১-কে ব্যবহার করে সৌরজগতে আমাদের অবস্থানসহ আরো কয়েকটি তথ্য পুরে দেওয়া হয় এতে। বার্তাটি পৃথিবী থেকে ছাব্বিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরের মহাশূন্যের এম১৩ নামে পরিচিত অসংখ্য নক্ষত্রে পরিপূর্ণ একটি ঘিঞ্জি এলাকার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা যেহেতু এম১৩ অঞ্চল হাজার হাজার নক্ষত্রে পরিপূর্ণ কাজেই সেখানে মহাজাগতিক কোন সভ্যতা থাকতেও পারে যারা হয়তো অধীর আগ্রহে বেতার দূরবীক্ষণ নিয়ে বসে আছে আমাদের বার্তার প্রতীক্ষায়।

চিত্র ৯.১ : পুয়ের্টোরিকোর আরেসিবোতে (Arecibo) অবস্থিত বিশালাকৃতির ট্রানসমিটার

এম১৩ নক্ষত্রপুঞ্জের উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠাতে প্রায় ১০ মিনিট সময় লেগেছিল। এই বার্তার মধ্যে উপাত্ত বিন্দুর (data point) সংখ্যা ছিল ১৬৭৯টি। এই সংখ্যাটি নির্বাচন করা হয়েছিল কারণ, এটা শুধু ২৩ ও ৭৩ এর গুণফল হতে পারে। যখন এই সংকেত এম১৩ নক্ষত্রপুঞ্জের যে সভ্যতার কাছে পৌঁছুবে তারা এটাকে মাত্র দু'ভাবে সাজাতে পারবে। একটি হল ২৩টি সারি যার ৭৩ টি উপাত্ত বিন্দু থাকবে। কিন্তু এই বিন্যাসের কোন অর্থ হবে না। অপর বিন্যাসটি অর্থাৎ ৭৩টি সারি ও ২৩ টি বিন্দু একটি ছবি তৈরি করবে যা বর্ণনা করে আমাদের সৌরজগৎ, মানব গঠনের রাসায়নিক ভিত্তি, মানুষের সাধারণ আকৃতি ও মানুষের সংখ্যাকে। এই বার্তা যদি বুদ্ধিমান প্রাণীরা পায় তার উত্তর আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌছুতে ৫২

হাজার বছর সময় লেগে যাবে। ততদিন কি মানব সভ্যতার অস্তিত্ব থাকবে? যদি নাও থাকে তারপরও এই বেতারবার্তা মানবজাতিকে স্বপ্ন দেখিয়েছে অনাগত স্বপ্নিল ভবিষ্যতের।

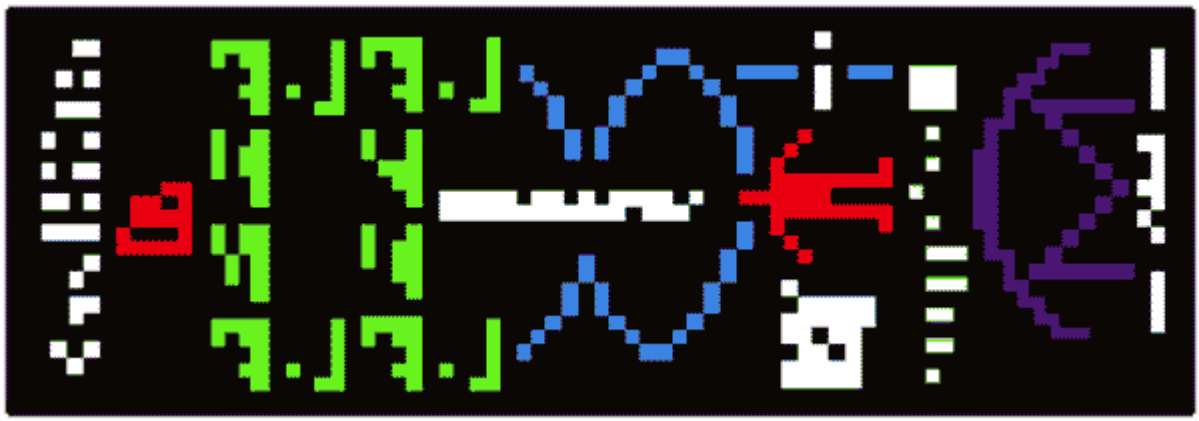

চিত্র ৯.২ : ১৯৭৪ সালে ২৬ হাজার আলোকবর্ষ দূরে হারকিউলিসের এম১৩ নক্ষত্রপুঞ্জের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা এই বেতারবার্তা পাঠিয়েছেন।

১৯৮২ সালে ডঃ হরোউইজ তার *সুটকেস সেটি* জুড়ে দেন পুয়ের্টো রিকোর (Puerto Rico) আরেসিবো মানমন্দিরের (Arecibo Observatory) সুবিশাল বেতার দূরবীক্ষণের সাথে। ৭৫ ঘন্টা ধরে সুর্যের মতো ২৫০ টি নক্ষত্রকে পর্যবেক্ষণ করে বুদ্ধিমান প্রাণীর পাঠানো বেতার সঙ্কেত খোঁজার চেষ্টা করেন তিনি। ড্রেকের মতোই তিনিও কিছুই খুঁজে পাননি। অবশ্য এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই, মিল্কিওয়ে ছায়াপথে ২৫০ টা নক্ষত্র সিন্ধুর মধ্যে বিন্দু কণা মাত্র।

সুটকেস সেটি-র পর হরোউইজ তৈরি করেন META (Megachannel Extraterrestrial Assay) নামের একটি গ্রাহক যন্ত্র যা একসঙ্গে ৮.৪ মিলিয়ন চ্যানেল পর্যবেক্ষণ করতে পারে। ১৯৮৫ সালে META ৮৪ ফুটের হার্ভাড ইউনিভার্সিটি/স্মিথসোনিয়ান বেতার দূরবীক্ষণের মাধ্যমে বোস্টন থেকে মহাজাগতিক সংকেত খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা শুরু করে। অন্যান্য *সেটি* প্রজেক্টগুলোও নতুন নতুন গ্রাহক যন্ত্র আবিষ্কার করে যেগুলো কয়েক হাজার থেকে কয়েক মিলিয়ন পর্যন্ত চ্যানেল একসাথে বিশ্লেষণ করতে পারে।

নব্বই দশকের শুরুর মধ্যেই প্রায় দশটা দেশে ষাটেরও বেশি সংখ্যক *সেটি* অনুসন্ধান কাজ শুরু হয়। যদিও কোন বহির্জাগতিক সংকেত পাওয়া যায়নি তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত আশাবাদী রয়েছেন। তাদের মতে, হয়তো একটিমাত্র সংকেত পাওয়ার জন্য কয়েক দশক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে তা সত্ত্বেও ভবিষ্যত যে উজ্জল সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা একমত ছিলেন, কেননা NASA তখন কয়েকটি বেতার দূরবীক্ষণের মাধ্যমে বড় ধরনের একটি *সেটি* প্রকল্প হাতে নিতে যাচ্ছিল।

ষাট এবং সত্তুরের দশকে নাসা *সেটি* কর্মকান্ডে হাল্কাভাবে জড়িত ছিল। ১৯৯২ সালে নাসা আনুষ্ঠানিকভাবে *সেটি* কার্যক্রম শুরু করে। কিন্তু পরবর্তী বছরেই কংগ্রেস এই কার্যক্রম বাতিল করে দেয়। NASA-র *সেটি* প্রকল্প ১২ মিলিয়ন ডলারের বাজেট নিয়ে শুরু হয় ১৯৯২ সালে, কিন্তু এই উচ্ছাসে বাধা আসে পরের বছরই। বাজেট সংকোচনের কারণে কংগ্রেস ১৯৯৩ সালে *সেটি* প্রকল্প থেকে আর্থিক অনুদান প্রত্যাহার করে নেয়। এর পর থেকে যত বড় ধরনের *সেটি* প্রকল্প চলেছে তার সবগুলোরই অর্থসংস্থান এসেছে মূলতঃ ব্যক্তিগত অনুদানের ভিত্তিতে।

NASA-র *সেটি* কার্যক্রমের ধবংসস্তুপ থেকে গড়ে উঠেছিল সান ফ্রান্সিসকো ভিত্তিক *সেটি* ইনস্টিটিউট-এর প্রজেক্ট ফিনিক্স (Project Phoenix)। নাসার *সেটি* প্রকল্প বাতিল হয়ে যাওয়ার পর বহু সংখ্যক নাসার প্রাক্তন বিজ্ঞানীরা ফ্রাঙ্ক ড্রেকের নেতৃত্বে *সেটি* ইনস্টিটিউটের প্রজেক্ট ফিনিক্সে যোগ দেন। প্রজেক্ট ফিনিক্স বেতার সিগন্যালের বাইরেও Drake Equation-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত হন। NASA-র *সেটি* প্রকল্প শেষ হওয়ার আগে এর বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছিলেন এমন একটা গ্রাহক যন্ত্র যা ২৮ মিলিয়ন চ্যানেল একই সময়ে মনিটর করতে পারে। প্রায় হাজার খানেক সুনির্দিষ্ট নক্ষত্রের উপর অনুসন্ধান চালানোর জন্য প্রজেক্ট ফিনিক্স এই গ্রাহক যন্ত্র ব্যবহার করেছে।

সেটি ইনস্টিটিউট-এর জোতির্বিদ সেথ সোস্টাক (Sheth Shostak)। *সেটি* প্রকল্প কিভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেঃ

> ‘প্রাথমিক ভাবে জ্যোতির্বিদরা তাদের বেতার দূরবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে কেবল পৃথিবীর কাছাকাছি নক্ষত্রেই অনুসন্ধান চালাবেন। এভাবে বেতার দূরবীনগুলো সমস্ত দিক থেকে মহাজাগতিক উপাত্ত সংগ্রহ করবে। কম্পিউটারের মাধ্যমে তখন উপাত্তগুলোকে বিভিন্ন চ্যানেলে ভাগ করে দেওয়া হবে। যেহেতু *সেটি* গবেষকেরা একসাথে সবগুলো চ্যানেলের দিকে দৃষ্টি রাখতে পারেন না, সেহেতু অন্য একটি কম্পিউটার এই তদারকিতে সাহায্য করবে; এটি বিদ্যুটে ধরণের কোন সংকেত পেলেই সেটি ‘বিপ্’, ‘বিপ্’ শব্দ করে গবেষকদের তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দেবে। সে ক্ষেত্রে কম্পিউটারটি থেকে উঁচু-নীচু পাহাড়ের ঢালের মত তরঙ্গাকারে সংকেত উৎপন্ন হতে থাকবে। যদি একটি সংকেত অন্যগুলোর চেয়ে উঁচুমানের হয়, তার মানে দাঁড়াবে সে সংকেতটি প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হওয়া সঙ্কেতের চেয়ে অনেক শক্তিশালী অর্থাৎ সঙ্কেতটি বর্হিজাগতিক সংকেত হওয়ার দাবীদার। কিন্তু পরবর্তী পরীক্ষণে যদি দেখা যায় যে, সঙ্কেতগুলো কোন এক পার্থিব টিভি স্টেশনের

বা যন্ত্রের কাছে রাখা মাইক্রো-ওভেনের ব্যতিচারের কারণে সৃষ্ট হয়েছে, তবে তা নিঃসন্দেহে বাতিল হয়ে যাবে।'

১৯৭৯ সালে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলের *সেটি* প্রকল্প হিসাবে 'Search for Extraterrestrial Radio from Nearby Developed populations (SERENDIP)'-এর কার্যক্রম শুরু হয়। *সেটি* ইনস্টিটিউট বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলের বেতার এস্ট্রোনমি ল্যাবের সহযোগিতায় *সেটি* গবেষণার জন্য বিশেষ এক ধরনের দূরবীক্ষণ ATP (Allen Telescope Array) উদ্ভাবনের চেষ্টা চালাচ্ছে। এই দূরবীক্ষণ দিয়ে 'Multibeaming' নামক এক ধরনের কৌশলের মাধ্যমে একই সাথে অসংখ্য পর্যবেক্ষণ অবলোকন করা সম্ভবপর।

বার্কলের আরেকটি চমকপ্রদ উদ্যোগ হচ্ছে SETI@home যা শুরু হয়েছিল ১৯৯৯ সালে। এটা এমন একটি প্রকল্প যেখানে যে কেউই ইচ্ছা করলেই ঘরে বসে এই প্রজেক্টে কাজ করতে পারবে। এর জন্য প্রয়োজন শুধু ইন্টারনেটের মাধ্যমে একটি ছোট্ট প্রোগ্রাম ডাউনলোড করা। যেহেতু বেতার দূরবীক্ষণ বিপুল পরিমাণ মহাজাগতিক উপাত্ত সংগ্রহ করে, কাজেই বিজ্ঞানীদের এই বিপুল সংখ্যক উপাত্তকে বিশ্লেষণ করতে হয় ভিনগ্রহের সভ্যতার সঙ্কেত কিনা তা যাচাই করার জন্য। কোন একক কম্পিউটারের পক্ষেই এতো ব্যাপক পরিমান তথ্য সামলানো সম্ভব নয়। কাজেই বার্কলের বিজ্ঞানী ড্যান ওয়ার্দিমার (Dan Werthimer) এবং ডেভিড এন্ডারসন (David Anderson) কয়েক মিলিয়ন কম্পিউটারকে এই কাজে লাগানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ওয়ার্দিমার এমন একটি সফটওয়ার তৈরি করেন যা ব্যক্তিগত কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের কম্পিউটার অবসরকালীন সময়ে সঙ্কেত অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকবে। ফলে কম্পিউটার ব্যবহারকারীর কাজে কোন বিঘ্ন ঘটবে না। কিন্তু কফি ব্রেকের সময় বা রাতের বেলায় এটি মূল গ্রাহক যন্ত্র থেকে বিপুল সংখ্যক উপাত্ত ডাউনলোড করবে এবং সেগুলো বিশ্লেষণ করবে। শতাধিক দেশের পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশি মানুষ এই প্রোগ্রামের সাথে বর্তমানে জড়িত রয়েছে।

পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ব্যাপী *সেটি* প্রকল্প শুরু হয়েছিল ১৯৭৪ সালে ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটির 'বৃহৎ কর্ণ' (Big Ear) বেতার দূরবীক্ষণের মাধ্যমে। বিগ ইয়ার *সেটি* প্রোগ্রামের ডিরেক্টর ডঃ রবার্ট এস ডিক্সন (Robert S. Dixon)-এর মতে *সেটি* অনুসন্ধান দুই ধরনের মহাজাগতিক সংকেত চিহ্নিত করতে পারে। একটি বেতার দূরবীক্ষণ হয়তো কোন একটি সভ্যতার অভ্যন্তরীণ *এফএম* বেতার টেলিভিশন সম্প্রচারের বেতার সঙ্কেত গ্রহণ করতে পারে। এই ধরনের সঙ্কেতকে বলা হয় নিঃসরণ (Leakage) এবং এর অনুসন্ধানকে বলা হয় আড়িপাতা (Evesdropping)। আরেকধরনের সঙ্কেত হতে পারে যা হয়তো কোন সভ্যতা পরিকল্পিতভাবে পাঠাচ্ছে এই আশায় যে আমরা সেই সংকেত গ্রহণ করবো। যেহেতু

এই সংকেতের মাধ্যমে কোন সভ্যতা তার অস্তিত্ব জাহির করছে তাই এই ধরনের সঙ্কেতকে বলা হয় বাতিঘর (Beakon)। ডঃ ডিক্সন বলেন যে, 'দুই ধরনের সংকেতই গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু বাতিঘরকে চিহ্নিত করা সহজতর হবে এই জন্য যে এটা অন্য সংকেতের চেয়ে শক্তিশালী হওয়ার কথা।'

শক্তিশালী হওয়া ছাড়াও অন্য একটি কারণে বাতিঘরকে চিহ্নিত করা সহজ হতে পারে। যোগাযোগের সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য, মহাজাগতিক সভ্যতা ম্যাজিক ফ্রিকোয়েন্সিতে সংকেত পাঠাতে পারে। এই ম্যাজিক ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে ১.৪ গিগাহার্জ (নিরপেক্ষ হাইড্রোজেনের ফ্রিকোয়েন্সি, যা মহাবিশ্বে সবচেয়ে বেশি পরিমানে বিদ্যমান) এবং ১.৭ গিগাহার্জ (হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সমাহারে তৈরি হাইড্রোক্সিলের ফ্রিকোয়েন্সি)।

সেটি প্রকল্পগুলো মাঝে মাঝে যে সংকেত পায়নি তা কিন্তু নয়। বেশ কিছু সংকেত মাত্র একবার পাওয়ার পরই আর কখনোই খুঁজে পাওয়া যায়নি। এধরনের সঙ্কেতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত সঙ্কেত হচ্ছে 'WOW signal' যা এসেছিল মিল্কিওয়ে ছায়াপথের মধ্যবর্তী আঞ্চলের একটি নক্ষত্র থেকে। ১৯৭৭ সালে 'বৃহৎ কর্ণ' এই সংকেত গ্রহণ করে। কর্মরত প্রকৌশলী সে সময় উত্তেজিত হয়ে চার্টের মধ্যে WOW লিখে ফেলেছিল আর সেখান থেকেই এই সঙ্কেতের নাম হয়ে যায় WOW সঙ্কেত। মহাজাগতিক সভ্যতার সঙ্কেত হিসাবে এটি একটি উদাহরণ হতে পারতো, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে এটা আসার সাথে সাথেই আবার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ডিক্সন বলেন, 'মনে হল যেন কেউ হঠাৎ করে সুইচ বন্ধ করে দিয়েছে। হতে পারে এটি কোন অতি গোপনীয় কোন সামরিক স্যাটেলাইটের অজানা কোন ফ্রিকোয়েন্সি, অথবা কোন বহির্জাগতিক সভ্যতার সঙ্কেত বা কোন ভিন গ্রহবাসীদের মহাকাশযান। আমরা হয়তো কোনদিনই জানতে পারবো না।'

ডঃ ডিক্সন ব্যাখ্যা দেন এভাবে যে, আমরা কখনোই দাবি করতে চাই না যে আমরা মহাজাগতিক প্রাণীর সাথে যোগাযোগ করেছি যা পরে ভুল প্রমানিত হোক। কাজেই *সেটি* অনুসন্ধানে জড়িত প্রত্যেকেই একটি *সেটি* সনাক্তকরণ বিধি-তে (SETI detection protocol) সই করেছে। আমরা যদি কখনো অচেনা কোন সঙ্কেত পাই যা মনে হতে পারে ভিন গ্রহ থেকে এসেছে, প্রথম কাজ আমরা যেটা করবো তা হচ্ছে খুব ভাল করে যাচাই করে দেখবো যে যন্ত্রপাতির কোন সমস্যা আছে কিনা। তারপর অন্যান্য *সেটি* অনুসন্ধান কেন্দ্রে খোঁজ নেওয়া হবে যে তারা একই ধরনের কোন সঙ্কেত পেয়েছে কিনা।

পল হরোউইজ তার ৮.৪ মিলিয়ন চ্যানেল META অনুসন্ধান প্রকল্প প্রায় দশ বছর ধরে চালিয়ে যান। এরমধ্যে মহাকাশ অভিযান এবং *সেটি* গবেষণায় আগ্রহী একটি দল প্লানেটারী সোসাইটির আর্থিক সহযোগিতায় তৈরি করেন তার Billion-Channel Extraterrestrial

Assay (BETA)- যা দুই বিলিয়ন বেতার চ্যানেল পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম ছিল। ১৯৯৫ সালে BETA কার্যক্রম শুরু হওয়ার সময় ডঃ হরোউইজ বলেন, 'এটা ভিন্ন ভিন্ন চ্যানেলে টিউন করা বহু লক্ষ বেতারযন্ত্র একসাথে আপনার ডেস্কে থাকার মত ব্যাপার।'

সেটি অনুসন্ধানের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে পৃথিবীতে ক্রমবর্ধমান মনুষ্য-সৃষ্ট বেতার ফ্রিকোয়েন্সী। এগুলো এই অনুসন্ধানে বিঘ্ন সৃষ্টি করে চলেছে প্রতিনিয়ত। সেল ফোন, পুলিশ র‍্যাডার, বা বিমান চলাচলের যোগাযোগ যন্ত্রগুলো প্রতি মুহূর্তে তৈরি করে চলেছে অসংখ্য বেতার ফ্রিকোয়েন্সী। এছাড়া পৃথিবীতে অবস্থিত বেতার দূরবীক্ষণ পৃথিবীর মাত্র এক অর্ধাংশ মহাকাশের সঙ্কেত গ্রহণ করতে পারে।

সেটি বিজ্ঞানীরা এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা ভাবনা করেছেন। বেতার ফ্রিকোয়েন্সির বিঘ্ন এড়ানোর জন্য চাঁদের অপর পৃষ্ঠে একটি *সেটি* পর্যবেক্ষণকেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে। অবশ্য এতে করে পৃথিবীর মতোই চাঁদও মহাকাশের অর্ধেককে ঢেকে রাখবে। অন্য একটি চিন্তা হচ্ছে, পৃথিবীর কক্ষপথে *সেটি* বেতার দূরবীক্ষণ স্থাপন করা। এতে করে যেমন মানব সৃষ্ট বেতার ফ্রিকোয়েন্সীর হাত থেকে বাঁচা যাবে, তেমনিভাবে একই সাথে কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়ায় সম্পূর্ণ মহাকাশকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে।

আরেসিবো মানমন্দিরের আশাবাদী বিজ্ঞানী মাইক ডেভিস বলেন যে, 'হয়তো দেখা যেতে পারে যে সারা মহাবিশ্বে জীবন কিলবিল করছে এবং প্রতিটি নক্ষত্র থেকে বুদ্ধিমান প্রাণীরা সঙ্কেত পাঠাচ্ছে।' মাইক ডেভিস এবং তার বেশিরভাগ সহকর্মীরা মনে করেন যে আমরা একদিন না একদিন বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব খুঁজে পাবো। অবশ্য এর বিপরীত সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বিজ্ঞান নাকি অপবিজ্ঞান?

অনেক বিজ্ঞানীই আছেন যারা মনে করেন যে, *সেটি* প্রকৃত বিজ্ঞান নয় বরং অপবিজ্ঞান বা ছদ্মবিজ্ঞান (Pseudoscience)। তাদের এহেন ধারণার প্রধান ভিত্তি হচ্ছে ভুল প্রমাণেয়তা (falsifiability) যার মাধ্যমে কার্ল পপার (Karl Popper) বিজ্ঞান এবং অপ-বিজ্ঞানের পার্থক্যের মানদন্ড করেছেন অত্যন্ত সুস্পষ্ঠভাবে। পপারের মতে, যুগে যুগে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা নয় বরং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গুলোর ভ্রান্তি প্রমাণের মধ্য দিয়ে : 'the criterion of *the scientific status of a theory is*

its falsifiability, *or refutability*, *or testability*'। এটাই হওয়া উচিৎ বিজ্ঞানের ছাঁকুনি। আর এই ছাঁকুনি চালনার জন্য দরকার নিগূঢ় পরীক্ষণের। পপারের ভাষায়,

> 'বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব ততক্ষণই থাকবে যতক্ষণ তত্ত্বগুলোকে কঠিন প্রায়োগিক পরীক্ষণের (empirical testing) মধ্যে দিয়ে চালানো যাবে। যখন কোন তত্ত্বকে পরীক্ষণের চেয়ে বরং সুরক্ষিত করে রাখার চেষ্টা করা হয়, তখন বুঝতে হবে এর মধ্যে গলদ রয়েছে।'

এই মানদন্ড অনুযায়ী *সেটি* কোনক্রমেই প্রকৃত বিজ্ঞান নয়, কারণ এতে ভুল প্রমাণেয়তার (falsifiability) অভাব রয়েছে। *সেটি* পরীক্ষণের ইতিবাচক ফলাফল সবিস্তারে বিভিন্নভাবে প্রচার করা হচ্ছে কিন্তু এই পরীক্ষণের সংজ্ঞায়িত ব্যর্থতার শর্তসমূহ কি তা সুস্পষ্ট ভাবে বলা হচ্ছে না। ১৮৫৩ সালে বহির্জাগতিক প্রাণ অনুসন্ধানের এক মূখ্য চরিত্র উইলিয়াম ওয়েহেল মন্তব্য করেছিলেন, 'যে (এলিয়েন সংক্রান্ত) বিতর্কে আজ আমরা নিয়োজিত তা বিজ্ঞানের রাজ্যের এমন এক প্রান্তসীমায় রয়েছে যেখানে জ্ঞানের শেষ আর অজ্ঞতার শুরু'।

কার্ল স্যাগানও তার বহুল বিক্রিত গ্রন্থ 'The Demon Haunted World: Science as a Candle in the Dark' -এ ভুল প্রমাণেয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন । তিনি যুক্তি (argument) যাচাই এবং ভ্রান্ত ও খুঁতযুক্ত যুক্তি উদঘাটনের জন্য বেশ কিছু উপায়ও বাতলে দেন যা Baloney Detection Kit নামে পরিচিত, বাংলায় আমরা এর নামকরণ করতে পারি -'মিথ্যা নির্ণায়ক যন্ত্র' হিসেবে। । এগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছেঃ

ক) কর্তৃপক্ষ বা 'গুরু'র যুক্তি খুব সামান্যই গুরুত্ব পাবে (বিজ্ঞানে এ ধরনের কোন 'গুরু'র অস্তিত্ব নেই)।

খ) অক্কামের ক্ষুর (Occam's razor)- যদি একই ধরনের দুটি অনুকল্প উপাত্তকে সমানভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে তবে এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজটিকে গ্রহণ করতে হবে।

গ) দেখতে হবে অনুকল্পটিকে ভ্রান্ত প্রমাণ করা সম্ভব কিনা। অন্য কথায় হাইপোথেসিস পরীক্ষণযোগ্য কিনা। অন্যরা একই ধরনের পরীক্ষা করলে সম ধরনের ফলাফল পাবে কিনা-এটি হতে হবে বিবেচ্য বিষয়।

মজার বিষয় হচ্ছে, স্যাগানকেই তার প্রদত্ত প্রকৃত বিজ্ঞান গবেষণার নির্দেশনা ভংঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করা যায়। স্যাগান নিজে কর্তৃপক্ষ হয়েও *সেটি* গবেষণার পক্ষে সাফাই গেয়েছেন। জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সকল উপাত্তই রায় দিয়েছে যে, আমাদের ছায়াপথে এখনো কোন বুদ্ধিসত্ত্বার পরিচয় মেলেনি। ফলে *সেটি* এমন একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করছে যা এখনো পর্যন্ত 'বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়' হয়ে ওঠার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি।

সেটি সমর্থকরা অবশ্য এই সমালোচনাকে পাশ কাটিয়ে গেছেন এই বলে যে, মূলধারার কোন বিজ্ঞানীই আজ পর্যন্ত মহাবিশ্বে বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্বের দাবী করেননি। বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব থাকতে পারে বা থাকার সম্ভাবনা আছে এমন কথাই শুধু বলা হয়েছে মাত্র, আর সে সম্ভাবনার নিরিখেই চলছে তাদের 'বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান'।

মহাজাগতিক বুদ্ধিমত্তার অনুসন্ধান : এক বর্ণাঢ্য জুয়াখেলা

মহাজাগতিক বুদ্ধিমত্তা খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা বিজ্ঞানের জগতের সবচেয়ে বড় জুয়াখেলা। কেউই জানে না এই গবেষণার ফলাফল কি হবে। হয়তো এই মহাবিশ্ব প্রাণশূন্য, আমরা ছাড়া আর কোন প্রাণীর অস্তিত্বই হয়তো নেই কোথাও। আমরা যদি *সেটি* অনুসন্ধান চালিয়ে যাই এবং ক্রমান্বয়ে উন্নতি করতে থাকি যেমন দিন দিন যদি চ্যানেল সংখ্যা বাড়তে থাকে, তাহলে হয়তো একদিন আমরা বর্তমানের চেয়ে আরো দক্ষ অনুসন্ধান চালাতে পারবো। কয়েক শত বছর পরেও যদি দেখা যায় যে কোন সঙ্কেতই পাওয়া যাচ্ছে না, তা হলে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া যাবে যে এই মহাবিশ্বে আমরাই একমাত্র বুদ্ধিমান সত্তা। তবে সেই আবিষ্কারও মহাজাগতিক প্রাণী আবিষ্কারের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেননা তখন আমরা উপলব্ধি করতে পারবো যে এই মহাবিশ্বে পৃথিবী নামক আমাদের এই প্রিয় গ্রহটি অনন্য সাধারণ এবং সেই সাথে জীবনও মহাবিশ্বে দুর্লভ কাজেই এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা আমাদেরই কর্তব্য। এখন পর্যন্ত অনন্ত মহাবিশ্বের মাত্র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে পরিচালনা করা হয়েছে অনুসন্ধান। বিশাল মহাবিশ্বের প্রায় পুরোটাই বলা যায় রয়ে গেছে মানুষের বোধ ক্ষমতার বাইরে। সেখানে কি আছে আর কি নেই, সে সম্পর্কে মানুষের ধারণা খুবই অপ্রতুল।

অনেকে আবার বলছেন এতো অর্থ অপচয় করে বহির্জাগতিক সভ্যতার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করার আদৌ কি কোন প্রয়োজন আছে? আর তা ছাড়া সে সমস্ত সভ্যতা যদি আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত আর শক্তিশালী হয় তবে তারা আমাদের খোঁজ পেয়ে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। এই ধরনের অভিযোগের উত্তরে কার্ল স্যাগান বলতেন, একটি উন্নত সভ্যতা থেকে আমরা যদি কোন বার্তা সত্যই পাই তাহলে দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টির মতো 'পরশ পাথর' খুঁজে

পাওয়ার যে সম্ভাবনা রয়েছে তা বিশাল। কিন্তু এই সুবিধা নির্ভর করছে প্রাপ্ত বার্তা কতো বিস্তারিত হবে তার উপর। এ সম্পর্কে আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। অবশ্য এই বার্তা পেলে একটি বিষয় স্পষ্ট হবে যে, উন্নত সভ্যতার অস্তিত্ব রয়েছে এবং ওই সভ্যতা আত্মধ্বংস এড়িয়ে যাওয়ার মতো কৌশলও রপ্ত করে ফেলেছে।

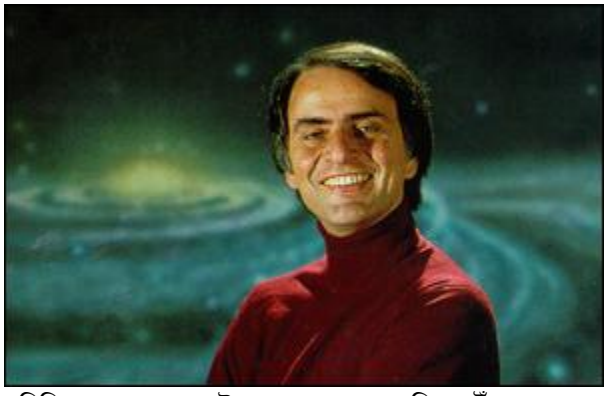

চিত্র ৯.৩ : কার্ল স্যাগান : যিনি স্বপ্ন দেখতেন এই মানব সভ্যতা একদিন পৌঁছে যাবে আন্তঃনাক্ষত্রিক মিলনমেলায়।

যে আত্মধ্বংস আমাদের মত প্রযুক্তিগতভাবে স্বল্প উন্নত সভ্যতার জন্য সমূহ বিপদ বলে মনে হয়, এবং যে বিপদের ভিতর আমরা প্রতিনিয়ত অবস্থান করছি : বিশ্বায়নের ফলে শক্তিশালী জাতিগুলোর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, জাতি-উপজাতিগুলোর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ বিগ্রহ, পরিবেশ দূষণ, সব কিছুর ঢালাও বাণিজ্যিকরণ, ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি। এই ধরনের আন্তঃ নাক্ষত্রিক বার্তা হয়ত আমাদের জন্য এমন একটি বাস্তব সুবিধা এনে দিতে পারে যাকে গণিত শাস্ত্রের ভাষায় বলে অস্তিত্বের তত্ত্ব (Existence theorem)। এর অর্থ হচ্ছে উন্নত প্রযুক্তি করায়ত্ব করেও আমরা হয়ত আত্ম ধ্বংসের পথ পরিহার করার উপায় সম্বন্ধে জানতে পারব এবং শান্তির সাথে বসবাস করতে পারব। আর খরচের কথা উঠলে এ কথা তো অবশ্যই বলা যায় যে, আধুনিক একটি যুদ্ধ জাহাজ যেমন ডেস্ট্রয়ার তৈরি করার খরচ দিয়ে বহির্জাগতিক প্রাণ অনুসন্ধানের খরচ অন্ততঃ দশ বছর চালিয়ে নেওয়া সম্ভব। এই গবেষণায় অর্থ ব্যয় করা দরকার শুধুমাত্র এই আশায় যে, সত্যিই যদি সাফল্য অর্জন করা যায় তবে তা হবে মানবজাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। সাফল্য অর্জন না করলেও খুব একটা সমস্যা নেই, কেননা এই গবেষণার ফলশ্রুতিতে বিজ্ঞানের এবং প্রযুক্তির যে অবিশ্বাস্য উন্নতি হচ্ছে তার সুফলও ভোগ করবে শেষ পর্যন্ত মানুষই।

মানুষের মহাজাগতিক ঠিকানা: দ্বিতীয় পৃথিবীর সন্ধানে

আরেকটি কারণেও এই ধরণের মহাজাগতিক গবেষণা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। আমাদের প্রযুক্তিভিত্তিক সভ্যতা এখন পুরোপুরি দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর ব্যবহার্য শক্তি আহরণের উপর।

কিন্তু যত দিন যাচ্ছে পৃথিবীর অব্যবহৃত শক্তির উৎস কমে আসছে, এমন একদিন আসবে যখন পৃথিবীতে ব্যবহার উপযোগি কোন শক্তিই হয়ত আর পাওয়া যাবে না। জীবাশ্ম জ্বালানীর মজুদ যাবে ফুরিয়ে। তখন আমাদের উত্তরসূরীদের হাত বাড়াতে হবে মহাজাগতিক সামগ্রিক উৎসের দিকে। পৃথিবীতে ব্যবহার্য শক্তির প্রধানতম উৎস হল সূর্য। চারশ কোটি বছর পার করে দিয়ে আজও সূর্য যেন 'প্রেটি ইয়ং', শক্তির এক 'অফুরন্ত ভান্ডার' যেন! কিন্তু তারপরও সূর্য কিন্তু চিরঞ্জীব নয়। বিজ্ঞানীরা সূর্যের মত কম ভরের একটি মাঝারি মানের* নক্ষত্রের মৃত্যুর চুড়ান্ত সময় নির্ধারণ করেছেন : আর সেটি এখন থেকে পাঁচশ কোটি বছরের মধ্যে। নক্ষত্র সৃষ্টির প্রথম যুগে ভর আর তাপমাত্রা যখন যথেষ্ট বেশি থাকে, তখন খুব বেশি বেগ সম্পন্ন হাইড্রোজেন পরমাণু পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে ফিউশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়। এটি ঘটে 'ত্রি-ধাপীয় তাপ-নিউক্লিয় ফিউশন' প্রক্রিয়ায়, যা 'হাইড্রোজেন দহন' নামে পরিচিত। এই হাইড্রোজেন দহনই আমাদের শক্তির মূল উৎস। কিন্তু আগামী পঞ্চাশ কোটি বছরের মধ্যে 'সোলার কোর'-এর সমস্ত হাইড্রোজেন ফুরিয়ে যাবে। এরপর সূর্য প্রসারিত হয়ে একটি 'ক্ষুদ্র দৈত্যে' পরিণত হবে। নামে ক্ষুদ্র হলেও এর আকৃতি হবে বর্তমান সূর্যের প্রায় তিনগুণ আর এর উজ্জ্বলতা হবে এখনকার উজ্জ্বলতার প্রায় দ্বিগুণ। সঙ্গত কারণেই পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাবে। ফলে, সমুদ্রের সমস্ত পানি তখন বাষ্পে পরিণত হবে। এ সময় যদি কোন প্রাণীকে টিকে থাকতে হয়, তবে অস্বাভাবিক উচ্চ তাপমাত্রাকে মোকাবেলা করে টিকে থাকতে হবে। পরবর্তী কয়েকশ কোটি বছরের মধ্যে সূর্য পরিণত হবে 'লোহিত দৈত্যে'। তখন সূর্যের ব্যাস হবে বর্তমান ব্যাসের শতগুণ, আর উজ্জ্বলতা হাজারগুণেরও বেশি। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে লোহিত দৈত্যে পরিণত হওয়ার পূর্বেই হিলিয়াম গ্যাসের স্ফুরণ ঘটবে। হিলিয়াম পোড়ার এই কাল হবে কয়েক কোটি বছর। হিলিয়াম পোড়ার শুরু থেকে সূর্য কিছুটা সঙ্কুচিত হলেও শেষ দশ লক্ষ বছরে সূর্য আবার প্রসারিত হতে থাকবে। এর তাপমাত্রা তখন দাড়াবে কয়েক হাজার কেলভিন, আর এর উজ্জ্বলতা বর্তমান উজ্জ্বলতার কয়েক হাজার গুণ। এরপর সূর্য তার বহির্স্তর ত্যাগ করবে, এর ফলে সূর্যের বহিররাবরণ থেকে উৎক্ষিপ্ত উপাদান নিয়ে 'প্ল্যানেটরি নেবুলা' তৈরি হতে পারে। তখনও যদি পৃথিবী ধ্বংস্প্রাপ্ত না হয়, তবে এর পোড়া পৃষ্ঠদেশ হবে গাঢ় অন্ধকার এবং শীতল। স্বভাবতই এটি হবে প্রাণহীন ও শুস্ক। সাদা বামনে বিবর্ণ রূপ ধারণ করবে আমাদের আজকের মহাপ্রতাপশালী নক্ষত্র সূর্য।

স্বভাবতই সূর্যের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানব সভ্যতার অবলুপ্তিকে অনেকেই মেনে নিতে পারেন না। নিঃসন্দেহে যে কোন 'নৈরাজ্যজনক পরিণতি'কে অতিক্রম করাই বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। সেজন্যই মানুষ হাজারো পার্থিব সমস্যার মধ্যে থেকেও আন্তঃনাক্ষত্রিক পরিভ্রমণের স্বপ্ন দেখে, যদিও এ প্রযুক্তি শৈশবও অতিক্রম করেনি। কিন্তু যত দিন যাবে এ

* 'মাঝারি মানের' বলা হল এ কারণে যে, সূর্যের মত গড়নের তারা আমাদের গ্যালাক্সি আকাশগঙ্গাতেই রয়েছে কয়েকশ কোটি। আবার কয়েকশ কোটি তারা রয়েছে যারা আমাদের সূর্য থেকেও অনেকগুণ বড় এবং উজ্জ্বল। সূর্য থেকে কম উজ্জ্বল তারার সংখ্যা তা থেকেও শতাধিক গুণ বেশি হবে।

প্রযুক্তি তত পরিণত হবে, এটি আশা করা যায়। এ ধরনের গবেষণায় রাষ্ট্রীয় বাজেট উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এমনকি পুরোমানব সভ্যতাকেও এর অন্তর্ভুক্তির সচেতন প্রয়াস চলছে বিভিন্ন ভাবে। কাজেই আন্তঃনাক্ষত্রিক পরিভ্রমণের মাধ্যমে মানবসভ্যতা স্থানান্তরকে আজ কিছু অলস মনের 'স্বপ্ন বিলাস' মনে হলেও আগামীতে এটি দেখা দিতে পারে 'বাস্তবতা' হিসেবে। বিখ্যাত বিজ্ঞান লেখক আর্থার সি ক্লার্ক মনে করেন যে, ২০৫৭ সালের মধ্যে চাঁদ, মঙ্গল কিংবা ইউরোপাতে মানব বসতি স্থানান্তর সম্ভব হতে পারে। জ্যোতির্পদার্থবিদ পল ডেভিসও অদূর ভবিষ্যতে মঙ্গলে বসতি স্থাপনের ব্যাপারে আশাবাদি। বিখ্যাত পদার্থবিদ এবং গণিতজ্ঞ ফ্রিম্যান ডাইসন মনে করেন কয়েক শতকের মধ্যে মাহাকাশের 'কুইপার বেল্টে' মানব বসতি স্থাপন সম্ভবপর হতে পারে। যেভাবে আমাদের পূর্বপূরুষেরা দুই লাখ বছর আগে একটা সময় আফ্রিকার গহীন অরণ্যে উদ্ভুত হয়ে ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল আহার আর বাসস্থানের তাগিদে, ঠিক তেমনিভাবে আমাদের উত্তরসূরীরা হয়ত পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে একটা সময় পা রাখবে আন্তঃনাক্ষত্রিক পরিমন্ডলে, খুঁজে নেবে এ অনন্ত মহাকাশের বুকে লুকিয়ে থাকা কোন এক 'দ্বিতীয় পৃথিবী'। মহাজাগতিক উপনিবেশের জন্য নয়, হয়ত অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই।

সমাপ্ত

নভেম্বর ৭, ২০০৬

{নবম অধ্যায়, *প্রাণের উৎস সন্ধানে (প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে)* : অভিজিৎ রায় এবং ফরিদ আহমেদ; অবসর প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ২০০৭ এর ফেব্রুয়ারী প্রকাশিতব্য}

তথ্যসূত্র দ্রষ্টব্য...